কবির ছেলেবেলা

ক বি র নি জে র মু খে

পুনর্লিখন
অরুণকুমার বসু

পুনশ্চ

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের লেখা, বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি-মাখা 'ছেলেবেলা' বইটা, বেরিয়েছিল কবির মৃত্যুর এক বছর আগে, আশ্বিন ১৩৪৭-এ। আর আমি তখন আট বছরের চৌকাঠে পা দিয়েছি। বছর খানেক পরে স্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় 'ছেলেবেলা' বইটা পুরস্কার পেয়েছিলাম। সম্ভবত তার দু-এক মাস পরেই ২২ শ্রাবণ কবিপ্রয়াণে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। যেন কেউ আমার হাত থেকে 'ছেলেবেলা' বইটাই কেড়ে নিল। কেন এমন মনে হয়েছিল আমি বলতে পারব না। তবে ছোটোদের উপযোগী করে লেখা রবীন্দ্রনাথের জীবনী ততদিনে আমার পড়া হয়ে গেছে। মনে আছে ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজি তৃতীয় পত্রে পাঠ্য ছিল My Boyhood Days, 'ছেলেবেলা'-র ইংরাজি অনুবাদ, Marjorie Sykes. সম্ভবত অনুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত আমার প্রথম কৈশোরের স্মৃতিলোকে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের ছবিগুলিই ছিল উজ্জ্বলতম।

আজও তার গায়ে একটুও ধুলো জমেনি।

'ছেলেবেলা' প্রকাশের প্রায় পঁচাত্তর বছর পরে কবির সেই বাল্য-কৈশোর বয়সের ওপর আমার এই আশি-পেরোনো বয়স আবার কী কৌতূহলে ঝুঁকে পড়েছে তার স্পষ্ট উত্তর আমার নিজেরই জানা নেই। আসলে বোধহয় কবির ছেলেবেলার কাহিনির সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলার পঠন-পাঠনের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। তাই মনে হল কবির 'ছেলেবেলা' বইটিকে আর একবার নতুন করে বললে কেমন হয়!

'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' এই দুটো বইতেই কবির বাল্য-কৈশোরের অজস্র স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আবার সেগুলির পুনরাবৃত্তি কেন? আমার মনে হয়েছিল আগে 'জীবনস্মৃতি' পরে 'ছেলেবেলা' এই দুই বইতে যত স্মৃতি কবি বর্ণনা করেছেন তা তো যথেষ্ট নয়। নানা সময়ে নানা রচনায় সে সব স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, সেগুলি এর সঙ্গে গেঁথে দিয়ে ছেলেবেলার পটটিকে আরেকটু স্বচ্ছ ও নির্মল করে একেবারে একালের ছেলেমেয়েদের পড়ালে-শোনালে কেমন হয়। ছেলেবেলার কথাও রইল, ছেলেবেলার বাইরে থেকে আনা আরও অনেক স্মৃতিও রইল। এইরকম ইচ্ছাই হয়তো 'কবির ছেলেবেলা'

লিখতে আমাকে তাগিদ দিয়েছে। এ ইচ্ছার ভালো-মন্দ দু-ই আছে। এতে কোনো স্পর্ধা প্রকাশ পাওয়ার কথা নয়। একে কেউ দুঃসাহস বলে যেন না ভাবেন। এ হল ছবির ছবি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন : গোঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল, ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম, ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তর-বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমা-সরহদ্দের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে, কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই 'ছেলেবেলা' আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বুদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারিদিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে 'অতি সামান্য পরিমাণেই।'

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে 'জীবনস্মৃতি'তে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনি, এ হল কাকলি;সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে— ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল, একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিলমে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে বালভাষিত গদ্যে।

আশি বছর বয়সে যে ৬০-৭০ বছর আগেকার স্মৃতি তিনি তুলে ধরেছেন তাতে বর্তমানের সঙ্গে সেই অতীতের বিস্তর ফারাক—তাঁর ভাবনায় "এখনকার সঙ্গে তার অন্তর

বাহিরের মাপ মেলে না।" অথবা, তাঁর ভাষায় "কেমন করে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে"—ছেলেবেলার এই সংকেতটাই আমি 'আমার ছেলেবেলা' বইতে মনে রেখেছি। তাতে কোনো অতিশয়োক্তি-যোগ ঘটেনি। আবার 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি এই বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিকে 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি' বলেছেন। তাঁর ভাষা ছেলেবেলার মতো সরল নয়, বালকপাঠ্যও নয়, তবু তার ভিতর থেকে চিত্ররূপটাই বড়ো হয়ে উঠেছে।

> স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয় , কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।
>
> এই রূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।
>
> আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে-চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে।
>
> কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, জীবনবৃত্তান্তের দুই-চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম, জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।
>
> এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাসসংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক

সে-পথটাতে চলিতেছে বা যে পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে, তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে সকল শহর এবং নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাহ্ণে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বে যখন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তখন আসন্ন দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোখে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যখন ঘটিল, সেদিকে একবার যখন তাকাইলাম, তখন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

কবির কথাতেই বোঝা যাচ্ছে দুই স্মৃতিরই লক্ষ্যমুখ আলাদা। 'ছেলেবেলা'য় তিনি ছবি এঁকেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য মনঃপ্রকৃতির পরিবর্তনটাকে বুঝিয়ে দেওয়া। আর 'জীবনস্মৃতি' যেন পটুয়ার আঁকা পটের তালিকা। তবে পুরোটাই হয়তো তাই নয়। মনঃপ্রকৃতির বিবর্তন 'জীবনস্মৃতি'তে কি কম আছে? 'জীবনস্মৃতি'-র লেখক শুধুই কি ছবি এঁকেছেন, এ কি চিত্রকরের ভাষা না মনের গভীরে সন্ধানের ভাষা :

মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, দূরবর্তী। কিন্তু তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে। পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপরে চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমি 'কবির ছেলেবেলা' বইতে 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি' দুই রীতিকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছি। দুই বইয়ের উপকরণকে একাকার করে নিয়েছি। পরবর্তীকালে অর্থাৎ যৌবন থেকে বার্ধক্যের দিনগুলিতে রচিত কবির শৈশবস্মৃতির অনেক উপকরণ প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছি।

অরুণকুমার বসু

আমার ছেলেবেলা

আমার যখন আশি বছর বয়স, তখন তোমাদের মতো ছোটো যারা, তাদের জন্যে লিখেছিলুম 'ছেলেবেলা' নামের বই। সে বই তোমরা তো সবাই পড়েছ। যদিও তখন আমার সেই আশি বছর বয়সে ছোটোবেলার স্মৃতি অনেকটাই ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তবু যা মনে ছিল, যতটুকু মনে ছিল, তোমাদের পড়ার জন্যে খুব যত্ন করে লিখেছিলুম। তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, তখনকার এই কলকাতা শহরটা কেমন ছিল, তার ছবি দিয়ে শুরু করেছিলুম। তবে আমার যখন খুব কম বয়স, তখন তো আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হত না। আমাদের বাড়ি ছিল চিৎপুরে। আর আমাদের বাড়িটা যে রাস্তার ঠিকানায় ছিল সেটা একটা সরু গলি। আমার ঠাকুরদার নামে সেই গলিকে সবাই বলত দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। আমার যখন চার-পাঁচ বছর বয়স তখন আমি ইস্কুলে ভরতি হই। বাড়ির ভেতর থেকে তোলা হত আমাদের ঘোড়ার গাড়িতে। সেই গাড়ির মধ্যে একেবারে বন্দি হয়ে থাকার মতো। ঘোড়া ছুটত টগবগ করে। গাড়ির মাথায় কোচম্যান, আর গাড়ির পিছনে থাকত সহিস। গাড়ির দরজা থাকত বন্ধ। একেবারে ইস্কুলের কাছে গিয়ে গাড়ি থামত। আমরা গাড়ি থেকে নামতুম। আর ইস্কুলে ঢুকে যেতুম। আবার বিকেল হলে ইস্কুল ছুটির পর সেই বন্ধ গাড়িতে চড়ে বাড়িতে ফিরতুম। ফলে গাড়ি কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারতুম না। অথচ ছেলেবেলা লেখার সময় যে শহরের বাবুরা কেমন করে খেয়ে -দেয়ে পান চিবোতে চিবোতে আপিসে কাছারিতে যেতেন, সে সব বলা হয়েছে। সেগুলো, বুঝতেই পারছ, সব শোনা কথা। যখন আমার দশ-এগারো বছর বয়স, তখন কলকাতায় খুব ডেঙ্গুজ্বর হচ্ছিল। সেই সময় বাবামশায়ের হুকুমে আমরা বাড়ি শুদ্ধ সবাই পেনেটি নামের একটা গ্রামে গিয়েছিলুম। এখন যাকে তোমরা বলো পানিহাটি। আমরা সেখানে ছিলুম মস্ত বড়ো সুন্দর একটা